শিক্ষাকে রাষ্ট্রের অনুষঙ্গ ভাবতে হবে, রাজনীতির নয়

খন্দকার মুনতাসীর মামুন

| ঢাকা , রোববার, ০২ জুন ২০১৯

সম্প্রতি লন্ডনের টাইমস হায়ার এডুকেশনাল জরিপের একটি প্রতিবেদনে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, সে তালিকায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। রয়েছে চীনের ৭২টি, ভারতের ৪৯টি ও তাইওয়ানের ৩২টি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম। তালিকায় ঠাঁই নিয়েছে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয় ও নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়। জঙ্গিবাদসহ বহু নেতিবাচক ভাবমূর্তির অধিকারী পাকিস্তানের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রয়েছে সে তালিকায়। জানা যায়, জরিপে শিক্ষাদান, গবেষণালব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটি আমাদের দেশের শিক্ষার নিম্নমানের একটি স্মারক বলে চিহ্নিত করা যায়। দেশে ৪৫টি সরকারি ও ৫৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কয়েকটিকে নিয়ে রয়েছে আমাদের বিশেষ গৌরববোধ। কিন্তু সেগুলো যে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর

কাছে পিছিয়ে যাচ্ছে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আলোচ্য প্রতিবেদন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক দেশের সামগ্রিক শিক্ষার মান আলোচনা। এ বিষয় পরীক্ষিত যে দেশের সব স্তরের শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। আর বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই। তাদের ভর্তি পরীক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উচ্চতর গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজধারীদের (জিপিএ) বিশাল অংশ পাস নম্বর পান না। ওই স্তরগুলোর শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে বড় ধরনের গলদ।

সম্প্রতি দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটির ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট : লার্নিং টু রিয়ালাইজ এডুকেশন প্রমিজ’ শীর্ষক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান সম্পর্কে করা হয়েছে মূল্যায়ন। তাতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়াসহ আরও নানা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে জরিপ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ অংশে বলা হয়েছে, শিক্ষায় দুর্বল মানের কারণে বাংলাদেশের একজন শিশুর ১১ বছরের স্কুলজীবনের প্রায় সাড়ে ৪ বছর নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা ১১ বছরে শেষে সাড়ে ছয় বছরের পাঠ্যক্রমের সমান। সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণীর প্রতি চারজন শিক্ষার্থীর তিনজনই নিজেদের শ্রেণীর উপযোগী সাধারণ মানের অঙ্ক কষতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ৩৫ শতাংশের বাংলা স্কোর খুবই

কম। এর ফলে তারা ভালোভাবে বাংলা পড়তে পারে না। ৪৩ শতাংশ বাংলায় কোন প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারে না। সে অবস্থায় শিক্ষার্থীদের অঙ্ক ও ইংরেজি শেখার মান যে কতটা শোচনীয় তা সহজেই অনুমেয়।

দেশে শিক্ষার মান ক্রমহ্রাসমান বলে বিভিন্ন মহল বারবার সতর্ক করছে। কেউ জোর দিয়ে এর বিপরীতেও বলছেন না। অর্থাৎ বক্তব্যটি অসার নয়। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে শিক্ষার প্রসার হয়েছে সত্য। কিন্তু মানের প্রসার হয়নি। হয়েছে অবনতি এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আমরা সেটা মেনে নিয়ে পথ চলছি। গত ১০ বছরে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ভর্তি ও পাসের হার, বৃত্তি-উপবৃত্তি-সবই বেড়েছে। কিন্তু অর্জনগুলো ম্লান করে দিচ্ছে নীতি-সিদ্ধান্তের দোদুল্যমানতা, পরীক্ষার আধিক্য, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম। আর এভাবেই শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে।

২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি করার পর এটাকে বড় অর্জন বলে মনে করে সরকার। কিন্তু আট বছরেও প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করাসহ শিক্ষানীতির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা আইন অপরিহার্য। কিন্তু আট বছরেও সেটি চূড়ান্ত হয়নি। এর পেছনে কোচিং সেন্টার ও নোট-গাইড বা অনুশীলন বই ব্যবসায়ীদের নানামুখী চেষ্টা কাজ করেছে বলে অভিযোগ আছে। কারণ, প্রস্তাবিত এই আইনে প্রাইভেট, কোচিং ও নোট-গাইড বই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শিক্ষা আইন না থাকায় নির্বাহী আদেশে চলছে শিক্ষাব্যবস্থা।

দেশে প্রশ্নপত্রে ভুলের ছড়াছড়ি। কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের সেই এক কথা, ‘তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।’ আর কে না জানে সেই তদন্ত আর আলোর মুখ দেখে না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কোন্ একজন শিক্ষক করেন না। সেটার একটা কমিটি থাকে। অনেক হাত ঘুরে সেটা ছাত্রদের কাছে যায়। কারও চোখেই যদি সেটা ধরা না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে গোড়াতেই গলদ রয়েছে। এমনিতেই ছাপা বইয়ে অসংখ্য ভুল, প্রশ্নফাঁসে শিক্ষার্থীরা জর্জরিত। এর মধ্যে প্রশ্নপত্রের ভুল বা অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ প্রয়োগ কতটা ভয়াবহতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে শিক্ষাজীবন তা হয়তো আঁচই করতে পারছেন না কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষার মানের নিম্নমুখিতার জন্য কম বিনিয়োগ দায়ী বলে ধারণা করা হয়। তবে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো, তখনো আনুপাতিক বিনিয়োগ তেমন বেশি ছিল, এমনটা বলা যাবে না। অতি সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমের গবেষণায় উঠে এসেছে, সন্তানদের লেখাপড়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি ব্যয় করতে হয় বাংলাদেশের অভিভাবকদের। তাদের জরিপে এসেছে প্রাইভেট, কোচিং ইত্যাদি খরচও। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলোর বেতন-ভাতাও অনেক। তাহলে এ ব্যয় অর্থবহ হচ্ছে না কেন? সংবিধান সবার জন্য শিক্ষা এবং সমশিক্ষার কথা বলেছে। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা ধরনের বৈষম্য দৃশ্যমান। শিক্ষার

ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ লক্ষ্যণীয়। দেশে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা সব খানেই আছে সরকারি এবং বেসকারি ব্যবস্থা। আছে কম খরচ আর বেশি খরচের লেখাপড়া। অবকাঠামো, আর্থিক এবং বিষয়গত বৈষম্য শিক্ষাকে সার্বজনীন হতে দেয়নি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় বাড়ানো উচিত, এ বিষয়ে কোন ভিন্নমত নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ অবকাঠামো, পাঠাগার ও গবেষণাগারের ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। এগুলো পরিচালনার জন্যও দিতে হবে যথাযথ মঞ্জুরি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ দরকার। আর এগুলো করবেন মূলত শিক্ষকেরা, সে শিক্ষক নিয়োগে একমাত্র মেধাকে প্রাধান্য দেয়া নীতির ওপর জোরালো আস্থা দরকার।

আজকাল একটা প্রশ্ন অনেকের মনেই ঘুরেফিরে আসে যে, এখন শিক্ষক হচ্ছেন কারা? শিক্ষকের যোগ্যতার মাপকাঠি কী? সেটা কী আগের মতোই আছে? শিক্ষকদের আগের সেই নৈতিকতা-মূল্যবোধ আছে? এক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তর পাওয়া কঠিনই বটে! যে শিক্ষক বা উপাচার্যের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষতার উদাহরণ ১০ টাকায় চা-সিঙ্গারা খাওয়া সেখানে শিক্ষার্থীর মেধা-মননের বিকাশ ঘটবে কী করে? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও অনেক গুণী ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষক রয়েছেন। তবে তাদের সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা তলিয়ে যাচ্ছে কোন না কোন

রাজনৈতিক দলের জোরালো সমর্থক ও তাদের কর্মসূচিতে অতি মনোযোগী ‘ধামাধরা’ শিক্ষকদের জন্য। শিক্ষক নিয়োগে এখন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপই প্রধান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে মেধায় স্বর্ণপদক পাওয়ার পর এমদাদুল হক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক হতে পারেননি। কারণ, ছাত্রলীগ তাকে পরীক্ষাই দিতে দেয়নি। আর উপাচার্য বলেছেন, পুনরায় পরীক্ষা নেয়ার সুযোগ নেই। এই হলো এদেশে মেধার মূল্যায়ন!

সংবিধানে সবার জন্য একই মানের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এদেশে শিক্ষার শুরুতেই নানা শ্রেণীবিন্যাস, নানা ধরন। ফলে এ শিক্ষা দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তোলে না। বরং এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে। আবার এটাও ঠিক যে প্রত্যেকের অধিকার আছে তার পছন্দের শিক্ষা নেয়ার। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, নানারকম শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করা। দেশের কওমি মাদরাসাগুলোতে কী পড়ানো হয় তা কেউ জানে না। এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষা সমাজে যদি শ্রেণী পার্থক্যের সৃষ্টি করে, তা ভালো শিক্ষা হতে পারে না।

কোন জাতির মেরুদন্ড ভেঙে দিতে হলে তার শিক্ষাব্যবস্থা তছনছ করে দিতে হয়। সেই পথেই হাঁটতে চেয়েছিল পাকিস্তানিরা আমাদের নিয়ে। তারা পারেনি। কিন্তু এখন আমরাই শিক্ষা নিয়ে আত্মঘাতী ছেলেখেলায় মেতে উঠেছি। ফলে তৈরি হচ্ছে মেধাহীন জাতি।

শিক্ষাকে রাষ্ট্রের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে; রাজনীতির নয়। এখন রাজনীতিকীকরণের ফলে শিক্ষার মানে প্রভাব পড়েছে, বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে। তিনি বলেন, পাঠদানবহির্ভূত অনেক কাজ করানো হয় প্রাথমিক শিক্ষকদের দিয়ে। এটা কেন? তারা যদি জরিপ করা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তাহলে ক্লাসরুমের কী হবে? এভাবে মান রক্ষা হয় না। অন্যদিকে শুধু বাজারমুখী শিক্ষা হলেও চলবে না। দর্শন ও দক্ষতার সমন্বয়েই শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য সত্যিকারের মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি।

আমাদের ‘ফলভিত্তিক শিক্ষা’ থেকে ‘শিখনভিত্তিক শিক্ষা’ পদ্ধতির দিকে যেতে হবে। ফলভিত্তিক শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত হয় না। কিন্তু শিখনভিত্তিক শিক্ষায় ভালো মান নিশ্চিত হয়। এভাবে দেশপ্রেম, নৈতিক মূল্যবোধ শিখবে শিক্ষার্থীরা। অথচ সে জায়গাটির বড় অভাব। শিক্ষকদের যেভাবে লার্নিং অ্যাপ্রোচ তৈরি করার কথা, তা হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের মাঝে মূল্যবোধ তৈরি করে দিতে হবে শিক্ষকদেরই। তাদের মধ্যে ভালোবাসার জগৎ তৈরি করতে পারেন শিক্ষকরা। তাদের স্নেহ করা, ভালো ব্যবহার করা, কোনোভাবে অপমানিত না করা; এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে শিক্ষক এগুলো প্রতিষ্ঠিত করবেন, তার ক্লাস করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে।

এটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, মানুষ ছাড়া আমাদের তেমন কোন সম্পদই নেই।

গোটা বিশ্বের কাছে আমাদের জনসম্পদ এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, দক্ষতাই রক্ষা করবে আমাদের অর্থনীতি, আমাদের ভবিষ্যৎ। রাষ্ট্র যেদিন এই সত্যটি উপলব্ধি করবে, সেদিনই শুধু অহং ছেড়ে সত্যিকারের মূল্যায়নের পথে অগ্রসর হতে শিখবে। বিশ্বের অনেক দেশ আছে যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। কঙ্গোয় সোনার খনি আছে। নাইজেরিয়া পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে সত্যিকারের মানবসম্পদ তৈরি করতে পারেনি বলেই দেশগুলো এখনও পিছিয়ে আছে। অথচ সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ের মতো দেশ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উন্নতির শিখরে উঠেছে। আবার প্রাকৃতিক সম্পদের হাহাকার থাকলেও শুধু দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে জাপান পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষ উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। কাজেই অগ্রসরমান সমাজ বিনির্মাণে মানসম্মত শিক্ষার বিকল্প নেই। মেধার কাজে যেন অযোগ্যরা স্থান না পায়, যেন কারণে-অকারণে রাজনীতি ঢুকে না পড়ে সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে।

[লেখক : সাংবাদিক]

Suva.muntasir@gmail.com